Notes prepared by: Suvajit paul.

Govt. approved college teacher (SACT: 1)

গ্রীন হাউস কাকে বলে

গ্রীন হাউজ হল এক রকম কাচের ঘর শীতপ্রধান দেশে যেখানে শাকসবজি ফলমূল ও বিভিন্ন উদ্ভিদের চাষ করা হয়। গ্রীন হাউজ এর আকার ছোট বারান্দা থেকে শুরু করে বৃহৎ শিল্পকারখানার সমান হতে পারে।ঐতিহ্যগতভাবে এটির ছাদ ও দেওয়াল কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে নির্মাণ করা হলেও আজকাল প্লাস্টিক ও অন্যান্য স্বচ্ছ পলিমার দিয়ে গ্রীনহাউস তৈরি করা হচ্ছে।

গ্রীন হাউজ নির্মাণে কেন কাঁচ বা সচ্ছ প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয় ?

কাঁচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিক আগত সূর্যরশ্মির তাপ ঘরে প্রবেশ করতে দেয়, কিন্তু বাইরে বের হতে দেয় না। আগত তাপ প্রতিনিয়ত গ্রীন হাউজ এর দেয়ালে বাধাপ্রাপ্ত ও প্রতিফলিত হয়।ফলে বাইরের পরিবেশে তুলনায় ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে যা শীতপ্রধান দেশে উদ্ভিদ জন্মানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট। শীতপ্রধান দেশের জলবায়ু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের গাছপালা ও শাকসবজি জন্মানোর উপযোগী নয়। তাই সেসব দেশে শীতকালেও গ্রীন হাউজ এর কৃত্রিম-উষ্ণ পরিবেশে শাকসবজি ও বিভিন্ন ফুল-ফলের চাষ করা হয়।ভিতরের সবুজ গাছপালার কারনেই এর নাম গ্রীন হাউস।

চলে এবার জেনে নেওয়া যাক গ্রীন হাউস এফেক্ট সম্পর্কে।

গ্রিনহাউস এফেক্ট বা গ্রীন হাউজ প্রভাব কাকে বলে ?

বায়ুতে উপস্থিত কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন এবং অন্যান্য কিছু গ্যাসের উপস্থিতির কারণে ট্রোপস্ফিয়ার (বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর) এর উষ্ণতা বৃদ্ধি গ্রিনহাউস এফেক্ট নামে পরিচিত । এই গ্যাসগুলি গ্রীন হাউজ গ্যাস নামে পরিচিত যার মধ্যে জলীয় বাষ্পের সর্বাধিক প্রভাব রয়েছে।

গ্রীন হাউজ ইফেক্ট এর কারন ব্যাখ্যা করো

পৃথিবীতে আগত সূর্যের আলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং পৃষ্ঠের দ্বারা প্রতিফলিত হয়, তবে বেশিরভাগটি পৃথিবী পৃষ্ঠ দ্বারা শোষিত হয়, যা পৃথিবীতে উষ্ণ করে। বিকিরিত ইনফ্রারেড এর কিছু **ইনফ্রারেড** রেডিয়েশন মহাশূন্যে চলে যায় তবে কিছু বায়ুমণ্ডলের গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি (বিশেষত জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মিথেন) দ্বারা শোষিত হয় এবং সমস্ত দিকগুলিতে পুনরায় ছড়িয়ে পড়ে, কিছু মহাকাশে এবং কিছুটা ভূপৃষ্ঠের দিকে ফিরে যায়। যেখানে এটি নিম্ন বায়ুমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠকে আরও উষ্ণ করে ।

গ্রীন হাউজ এফেক্ট শব্দটির উৎস অস্পষ্ট। ফরাসী গণিতবিদ জোসেফ ফুরিয়ারকে মাঝে মধ্যে গ্রীন হাউজ ইফেক্ট শব্দটির ব্যবহারকারী হিসাবে প্রথম ব্যক্তি হিসাবে ক্রেডিট দেওয়া হয়।

গ্রীন হাউজ প্রভাব শব্দটির উৎস অস্পষ্ট। ফরাসী গণিতবিদ জোসেফ ফুরিয়ারকে কখনও কখনও প্রথম ব্যক্তি হিসাবে কৃতিত্ব দেওয়া হয় যিনি গ্রিনহাউস ইফেক্ট এর ধারণাটি 1824 সালে ব্যাবহার করেছিলেন তার এই বক্তব্যের ভিত্তিতে যে ,

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল একটি "হটবক্স" - যা একটি হিলিয়াম থার্মোমিটার এর মত কাজ করে"

- যা সুইস পদার্থবিদ হোরেস বেনেডিক্ট ডি সোসর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, যা শীতল বাতাসকে গরম বাতাসের সাথে মিশতে বাধা দেয়। তবে ফুরিয়ার গ্রীন হাউজ এফেক্ট শব্দটি ব্যবহার করেননি বা বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসগুলি পৃথিবীকে উষ্ণ করার কথা উল্লেখ করেননি।

সুইডিশ পদার্থবিজ্ঞানী এবং শারীরিক রসায়নবিদ সোভান্তে আরহেনিয়াসকে 1896 সালে এই শব্দটি ব্যাবহারের কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলি কীভাবে তাপ আটকে দেয় তার একটি জলবায়ু মডেল প্রকাশ করে ছিলেন। আরহেনিয়াস তার বই "**ওয়ার্ল্ডস ইন দ্য মেকিং**" (১৯০৩) গ্রন্থে প্রথম বায়ুমণ্ডলের এই "হট-হাউস থিওরি" -কে উল্লেখ করেছেন যা পরে গ্রীন হাউজ এফেক্ট হিসাবে পরিচিত ।

গ্রীন হাউজ প্রভাব কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মিথেনের মতো বায়ুমণ্ডলীয় জমে জমে যা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে নির্গত তাপের কিছু অংশ ধারণ করে।

গ্রীন হাউজ প্রভাব দ্বারা সৃষ্ট উত্তাপ বাদ দিলে পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা কেবলমাত্র − 18 ° C (0 °F) হবে। শুক্র গ্রহে র বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের খুব উচ্চ ঘনত্বের ফলে চূড়ান্ত গ্রীনহাউস প্রভাব ঘটে যার ফলে ওই গ্রহের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা 450 ° C (840 ° F) হয়ে যায়।

যদিও গ্রিনহাউস এফেক্টটি প্রাকৃতিকভাবে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা, তবে মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন দ্বারা এই প্রভাব আরও তীব্র করা যেতে পারে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শিল্প বিপ্লবের সূচনা থেকে

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় 30 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মিথেনের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে।

গ্রীন হাউস গ্যাস কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার গ্রিনহাউস গ্যাসের শতকরা নির্গমন ও প্রভাব:

গ্রীন হাউজ ইফেক্টের জন্য দায়ী গ্যাস গুলি কে গ্রীন হাউজ গ্যাস বলে।

কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2):

কার্বন ডাই অক্সাইড জীবাশ্ম জ্বালানী (কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেল), কঠিন বর্জ্য, গাছ , অন্যান্য জৈব পদার্থের দহনে এবং নির্দিষ্ট রাসায়নিক প্রতি

ক্রিয়ার ফলে (যেমন, সিমেন্ট উৎপাদন) মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। জৈব কার্বন চক্রের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড অপসারিত হয়।জীবাশ্ম জ্বালানি ও কারখানা থেকে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ মোট গ্রীন হাউজ গ্যাসের **শতকরা 65 শতাংশ এবং বন ও অন্যান্য বিভাগ থেকে শতকরা 11 শতাংশ।**

মিথেন (CH4):

কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেল উৎপাদন এবং পরিবহণের সময় মিথেন উৎপাদন হয়। পচা ডোবা ও পড়ে থাকা জমির জৈব বর্জ্য পচন এর মাধ্যমে মিথেন উৎপাদিত হয়। মিথেন নির্গমনের শতকরা হার 16 শতাংশ।

Greenhouse Gas CO2(Fossil fuel):…CO2(forest ryand otherland):11%Methane:16%Nitrousoxide: 6F-Gasses:2%16%11%65%

GH gas	Emission Persont
CO_2 (Fossil fuel AND factort): 65%	65
CO_2 (forestry and other land):11%	11
Methane :16%	16
Nitrous oxide: 6	6
F-Gasses :2%	2

নাইট্রাস অক্সাইড (NO_2):

নাইট্রাস অক্সাইড কৃষি ও শিল্পকর্মের সময় জীবাশ্ম জ্বালানী এবং কঠিন বর্জ্য জ্বলনের সময় নির্গত হয়। নাইট্রাস অক্সাইডের নির্গমন শতকরা 6 শতাংশ।

ECT & GLOBAL WARMING

তরল গ্রীন হাউজ গ্যাস:

হাইড্রোক্লোরোকার্বন, পারফ্লুরোকার্বন, সালফার হেক্সাক্লোরাইড এবং নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড হ'ল সিন্থেটিক, শক্তিশালী গ্রীন হাউজ গ্যাস যা বিভিন্ন শিল্প প্রক্রিয়া থেকে নির্গত হয়। ক্লোরাইডযুক্ত গ্যাসগুলি মাঝে মাঝে স্ট্রেটোস্ফেরিক ওজোন-হ্রাসকারী পদার্থের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয় (যেমন, **ক্লোরোফ্লুরোকার্বন**, **হাইড্রোক্লোরফ্লুওরোকার্বন** এবং **হ্যালন**)। এই গ্যাসগুলি সাধারণত অল্প পরিমাণে নির্গত হয় তবে এগুলি শক্তিশালী গ্রীন হাউজ গ্যাস হওয়ায় এগুলি কখনও কখনও উষ্ণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্ভাব্য গ্যাস হিসাবে পরিচিত। এরকম গ্যাসের শতকরা নির্গমন 2%।

গ্রীন হাউজ ইফেক্টের ভবিষ্যতে ক্ষতিকর প্রভাব

অনেক বিজ্ঞানী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির বৃদ্ধি 1986-2005 এর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির তুলনায় একবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি আরোও 3–4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়িয়ে তুলতে পারে।

। এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন করতে পারে এবং খরা ও বৃষ্টিপাতের নতুন নিদর্শন তৈরি হতে পারেএবং চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে বন্যা সৃষ্টি করতে পারে এবং সম্ভবত কিছু অঞ্চলে খাদ্য উত্পাদন ব্যাহত করতে পারে।

গ্রীন হাউস প্রভাব বা গ্রীন হাউস এফেক্ট (GREEN HOUSE EFFECT):

সাধারণতঃ উচ্চ অক্ষাংশে শীতপ্রধান উন্নত দেশসমূহে শাক-সবজি উৎপাদনের জন্য তৈরী বিশেষ একধরনের কাঁচের AS GREEN HOUSE. কাঁচ স্বাভাবিকভাবেই সূর্যের আগত ক্ষুদ্র তরঙ্গরশ্মিকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়, কিন্তু প্রতিফলিত দীর্ঘ তরঙ্গের সৌরবিকিরণকে কাঁচ কোনোভাবেই বাইরে বেরোতে দেয় না, ফলে এই ঘরের মধ্যে তাপমাত্রা আটকা পড়ে ক্রমশ ঘরের অভ্যন্তরস্থ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শাক-সবজি বা গাছপালা জন্মানোর জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠে ।

বর্তমানে পৃথিবীর ATMOSPHERE অনেকটা গ্রীন হাউসের মত আচরণ করছে । সূর্যকিরণ থেকে পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ বিকিরণ আসে তার ৩৪ % (২ % ভূপৃষ্ঠ থেকে, ৭ % বায়ুমন্ডল থেকে এবং ২৫ % মেঘপুঞ্জ থেকে) বিকিরণ মেঘপুঞ্জ, ধুলিকণা প্রভৃতি দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায় । পৃথিবী থেকে সূর্যরশ্মির প্রত্যাবর্তনের এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে অ্যালবেডো (Albedo) বলে । এই প্রতিফলিত অ্যালবেডো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলকে কোনোভাবেই উত্তপ্ত করতে পারে না, ফলে তা পৃথিবীর তাপের

ভারসাম্য বজায় রাখতে বিরাট ভূমিকা নেয় । কিন্তু গত বেশ কয়েক দশক ধরে বায়ুমন্ডলে অবস্থিত কিছু গ্যাস ও অন্যান্য উপাদান (কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাস্প নাইট্রোজেন অক্সাইড প্রভৃতি) পৃথিবীর তাপমাত্রাকে ধরে রাখছে গ্রীন হাউসের কাঁচের দেওয়ালের মতো । কারন, এই গ্যাসগুলিও গ্রীন হাউসের কাঁচের মতো সূর্যের আগত ক্ষুদ্র তরঙ্গরশ্মিকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়, কিন্তু প্রতিফলিত দীর্ঘ তরঙ্গের অ্যালবেডোকে পুরোপুরি বাইরে বেরোতে বাঁধা দিচ্ছে । ফলে এই বায়ুমন্ডলসহ পৃথিবীর মধ্যে তাপমাত্রা আটকা পড়ে গড় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই ঘটনাকেই **গ্রীন হাউস প্রভাব** বা **গ্রীন হাউস এফেক্ট** (Green House Effect) বলা হচ্ছে ।

☻ বিভিন্ন গ্রীনহাউস গ্যাসের নাম ও তাদের উৎসঃ গ্রীন হাউস প্রভাব বা গ্রীন হাউস এফেক্ট সৃষ্টিকারী বিভিন্ন গ্যাসগুলি ও তাদের উৎসগুলি হলো নিম্নরূপ –

১.কার্বন-ডাই অক্সাইড:

উৎস- বনজ সম্পদ দহন, আগ্নেয়গিরি, জৈব জ্বালানি, বনভূমি

বিনাশ, ভূমিব্যবহার পদ্ধতি প্রভৃতি ।

২.মিথেন:

উৎস- জলাভূমি, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের নির্যাস, জৈবসার, ধান

উৎপাদন, গবাদিপশু প্রভৃতি ।

৩.নাইট্রাস অক্সাইড:

উৎস- বন, ঘাস, সমুদ্র, মাটি, সার, জৈবসার, জৈবজ্বালানী প্রভৃতি

৪.ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC):

উৎস- রেফ্রিজারেটর, এরোসল স্প্রে, ফোম, রং প্রভৃতি।

৫.ওজোন:

উৎস- প্রাকৃতিকভাবে সূর্যের আলো দ্বারা অক্সিজেন থেকে সৃষ্ট

এবং কৃত্রিমভাবে ফটোকেমিক্যাল ধোয়া উৎপাদন থেকে সৃষ্ট।

☻ **বায়ুমন্ডলে গ্রীন হাউস প্রভাব / গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধির কারণঃ** বায়ুমন্ডলে গ্রীন হাউস প্রভাব ও গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধির কারণগুলি হলো নিম্নরূপ –

১) জীবাশ্ম জ্বালানীর পরিমান বৃদ্ধিঃ কলকারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন সবকিছুতেই জীবাশ্ম জ্বালানী জ্বালানোর পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে, ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণও দিনে-দিনে লাফিয়ে বাড়ছে।

২) রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধিঃ কৃষিতে নাইট্রোজেন সার (যেমন – ইউরিয়া) ব্যাবহারের ফলে বাড়ছে নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণও।

৩) অরণ্যচ্ছেদনঃ গাছপালা উজাড় হওয়ার ফলে বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নেওয়ার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

৪) মিথেনের পরিমান বৃদ্ধিঃ গাছপালার পচন, কৃষিজ বর্জ্য এবং জীবজন্তুদের বর্জ্য থেকে সৃষ্ট মিথেন গ্যাসের পরিমাণও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

☻ **গ্রীন হাউস প্রভাবের ফলাফলঃ** গ্রীন হাউস প্রভাব বা গ্রীন হাউস এফেক্ট – এর ফলাফলগুলি হলো নিম্নরূপ –

ক) পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিঃ বায়ুমন্ডলে গ্রীন হাউজ প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবী গত ২০ লাখ বছরের মধ্যে সবচেয়ে গরম হয়ে যাবে। ১৮৮০ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা ০.৬°C বেড়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর

উষ্ণতা ২.৫°C এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ৩.৮°C বেড়ে যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত ২০০০০ বছরের তুলনায় শেষ শতকে বিশ্বের উষ্ণতা বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দুটি অধ্যায়ে (যথা – ১৯২০–১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ এবং ১৯৭৬–২০০০ খ্রিষ্টাব্দ) উষ্ণতা সবথেকে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে হিসাব করলে বিশ্বের উষ্ণতম দশক হচ্ছে ১৯৯০ এর দশক। নাসার গোদার্দ ইনস্টিটিউট ফর স্পেন স্টাডিজের হিসাব অনুযায়ী ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে উষ্ণতম বছর। কিন্তু ওয়ার্ল্ড মিটিয়েরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট ও ক্লাইমেট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতে উষ্ণতম বছর হলো ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ এবং দ্বিতীয় উষ্ণতম বছর হলো ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ।

খ) মেরু অঞ্চলের বরফ গলনঃ এর ফলে বিষুবীয় ও মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে। মনে করা হচ্ছে, আর ১০০ বছরের মধ্যে সুমেরু কুমেরুতে গরমকালে সমস্ত বরফ জলে পরিনত হবে। শীতে অল্প বরফ থাকবে।

গ) সমুদ্র জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধিঃ ক্রমবর্ধমানহারে গ্রীন হাউজ প্রভাবের ফলে সমুদ্রের স্তর ৩০ – ৪০ সেন্টিমিটার বেড়ে যাবে। এর ফলে পৃথিবীর উপকূলবর্তী এলাকার (পশ্চিমবঙ্গ,বাংলাদেশসহ) একটি বিরাট অংশ সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

ঘ) রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিঃ মালেরিয়া, গোদ, কলেরা, ডেঙ্গু বাড়বে; কারণ জল বাড়লে মশা বাড়বে। আরো ভিন্ন রোগ ফিরে আসবে, নতুন রোগ আসবে।

ঙ) বাস্তুতন্ত্রের বিনাশঃ সমুদ্রে ক্ষারের পরিমাণ কমবে, ফলে ক্ষারে বেচে থাকা জীবের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ ঘটবে।

চ) আবহাওয়ার প্রকৃতি পরিবর্তনঃ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবার ফলে অধঃক্ষেপণের পরিমান, ঝড়ঝঞ্জার প্রকোপ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাবে। ঘূর্ণীঝড়ের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। বৃষ্টিবহুল এলাকা নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ক্রমশ বাড়তে থাকবে। ফলে আবহাওয়ার প্রকৃতি পরিবর্তন হবে।

ছ) ফসলের ক্ষতিঃ আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে ফসলের সমূহ ক্ষতি হবে এবং উৎপাদন কমে যাবে।

এছাড়াও, **জ) বনাঞ্চল ধ্বংস** হবে, **ঝ) পানীয় জলে সংক্রমণ** দেখা দেবে, **ঞ) বন্যজন্তুর সংখ্যা হ্রাস** পাবে, **ট) মানুষের আবাসস্থলের সংকট** দেখা দেবে, **ঠ) বিশ্বজুড়ে খাদ্যভাব** প্রকট হবে **, ড)** স্থানবিশেষে কোথাও **ক্ষরা,** আবার কোথাও **বন্যার প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি** পাবে। সব মিলিয়ে পৃথিবীতে নতুন নতুন ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হবে।

৬ গ্রীন হাউস প্রভাব নিয়ন্ত্রনের উপায়ঃ গ্রীন হাউস প্রভাব নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি হলো নিম্নরূপ –

ক) জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার হ্রাসঃ কলকারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন সবকিছুতেই জীবাশ্ম জ্বালানী জ্বালানোর পরিমান ক্রমশ যতটা পারা যায় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ যথাসম্ভব কমাতে সম্ভব হবে।

খ) রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাসঃ কৃষিতে নাইট্রোজেন সার (যেমন – ইউরিয়া) ব্যবহারের ফলে বাড়ছে নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ। অবিলম্বে কৃষিকাজে রাসায়নিক সারের ব্যবহার যথাসম্ভব কমাতে হবে।

গ) মিথেন নির্গমনের পরিমাণ হ্রাসঃ গাছপালার পচন, কৃষিজ বর্জ্য এবং জীব জন্তুদের বর্জ্য থেকে সৃষ্ট মিথেন গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিথেনের এই সকল উৎসগুলিকে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ঘ) অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিঃ অচিরাচরিত শক্তি বলতে বোঝায় যেসব শক্তির উৎস পুনর্নবীকরণ করা যাবে অর্থাৎ, ফুরিয়ে গেলেও আবার তৈরি করে নেওয়া সম্ভব। জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারে বায়ুমন্ডলে গ্রীণ হাউস গ্যাসের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশ। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানীর পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার করলে বায়ুমন্ডলে গ্রীণ হাউস গ্যাস (যেমন – কার্বন-ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ওজোন) এর পরিমাণ কমে আসবে।

ফলে পরিবেশ দূষণ অনেকটাই কমে যাবে। সাম্প্রতিক কালে এই অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলাপ আলোচনা হচ্ছে। এই চিরাচরিত শক্তিগুলি হলো – সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস, বায়োডিজেল, জোয়ার-ভাটা শক্তি, ভূ-তাপীয় শক্তি, আবর্জনা থেকে প্রাপ্ত শক্তি, নিউক্লিয়ার এনার্জি প্রভৃতি।

ঙ) ই-ওয়েস্ট বা ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য আমদানী বন্ধঃ উন্নত বিশ্বের দেশগুলো থেকে নানা ধরণের ই-ওয়েস্ট বা ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য আমদানী হচ্ছে আমাদের দেশে। এভাবে প্রতি বছর প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ব্যবহৃত (সেকেন্ড হ্যান্ড) কম্পিউটার তৃতীয় বিশ্বে পাঠানো হচ্ছে। এসব কম্পিউটারের অন্যতম ক্রেতা হলো – চীন, ভারত ও বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলি। অর্থাৎ, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে পরোক্ষভাবে উন্নত দেশগুলোর ইলেক্ট্রনিক বর্জ্যের আস্তাকুড়ে পরিণত করা হচ্ছে। এই সব ই-বর্জ্যের মধ্যে হাজার হাজার টন সীসাসহ রয়েছে আরও বহু বিষাক্ত উপাদান যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসছে। এসব দূষিত বর্জ্য পদার্থ বিভিন্নভাবে গ্রীন হাউস প্রভাব বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সরাসরি কৃষি সম্পদ, মৎস্যসম্পদ, বনজ সম্পদ বিনষ্টেরও অন্যতম কারণ।

চ) পরিকল্পিত বনায়নঃ বিশ্বজুড়ে যখন গ্রীন হাউস প্রভাবের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষেধক হল অরণ্য। একদিকে অরণ্যচ্ছেদন রোধ ও অন্যদিকে পরিকল্পিতভাবে বনায়নের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যপী গ্রীন হাউস প্রভাব অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ছ) শক্তিসাশ্রয়ী আবাসনঃ আমাদের জীবনযাপনের সবক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। বড় বড় অট্টালিকা, বাড়িঘর বা বড় দালান নির্মাণে প্রয়োজনীয় খালি জায়গা রাখতে হবে। প্রাকৃতিক আলো-বাতাসের প্রবেশ যেন সহজে হয় সে ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে যাতে কম বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে হয়, লিফট, জেনারেটর, এয়ার কন্ডিশন এসবের ব্যবহার কমাতে গ্রীণ বিল্ডিং টেকনোলজির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। শহরের পাশাপাশি গ্রামের বাড়িঘর নির্মাণেও বিদ্যুত সাশ্রয়ী সবুজায়ন প্রয়োজন।

জ) পরিবেশ রক্ষাসংক্রান্ত চুক্তিগুলির দ্রুত বাস্তব রূপায়ণঃ বিশ্বে ক্রমবর্দ্ধমান গ্রীন হাউস প্রভাব নিয়ে চুক্তিগুলির দ্রুত বাস্তব রূপায়ণ খুবই দরকার। কেবলমাত্র আলাপ-আলোচনা নয়, দরকার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির দ্রুত ও বাস্তব রূপায়ণ।

ঝ) বিকল্প ও পরিবেশবান্ধব দ্রব্য ব্যবহারঃ গ্রীন হাউস প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদানগুলির বিকল্প ও পরিবেশবান্ধব দ্রব্য ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে।

ঞ) নাগরিক দায়িত্বঃ পরিবেশ রক্ষা নাগরিকদের মৌলিক দায়িত্ব। তাই গ্রীন হাউস প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদানগুলি যাতে পরিবেশে কম পরিমানে উৎপাদিত হয়, সে বিষয়ে সকলকেই দায়িত্বশীল হতে হবে।

ট) নতুন প্রযুক্তিঃ গ্রীন হাউস প্রভাব প্রতিরোধের চূড়ান্ত উত্তর হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত উপাদান পরিবর্তন, যানবাহনের দক্ষতা বৃদ্ধি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড পৃথকীকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রভৃতিসহ বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং (GLOBAL WARMING):

GREEN HOUSE EFFECT AND OZONE LAYER DEPLATION অরণ্যচ্ছেদন প্রভৃতি কারণে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিগত ৮০০০ বছর ধরে এই তাপমাত্রা প্রায় স্থির ছিল। কিন্তু গত ১০০ বছরের হিসেবে প্রমাণিত যে এই তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণা করে দেখা গেছে, বিগত ১০০ বৎসরে পৃথিবীর তাপমাত্রা ০.৫° C বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১.৫°-২.০° C পর্যন্ত এবং ২১০০ সালের মধ্যে ১.৮°C থেকে ৬.৩° C এর মতো বৃদ্ধি পেতে পারে। সারা পৃথিবী জুড়ে উষ্ণতার এই ক্রমবর্দ্ধমান বৃদ্ধিকেই বিজ্ঞানীরা **বিশ্ব উষ্ণায়ন** বা **গ্লোবাল ওয়ার্মিং** (Global Warming) নামে অভিহিত করেছেন।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কারনঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং – এর কারনগুলি হলো নিম্নরূপ –

১) জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধিঃ কলকারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন সবকিছুতেই জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার দিন দিন বাড়ার ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমণের পরিমাণও দিন দিন লাফিয়ে বাড়ছে ।

২) CFC-এর ব্যবহার হ্রাসঃ ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC11, CFC12) বা ফ্রেয়ন একটি বিশেষ যৌগ, যা LOSS OF OZONE বিনাশনের জন্য বিশেষভাবে দায়ী । এই CFC প্রধানত রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, ফোম শিল্প, রং শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, সুগন্ধি শিল্প, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রের সার্কিট পরিষ্কার প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকে নির্গত হয় ।

২) নাইট্রাস অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফারের কণা উৎপাদন বৃদ্ধিঃ কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যবহার, যানবাহন, নাইলন শিল্প প্রভৃতি কলকারখানা-যানবাহনের বিষাক্ত কালো ধোঁয়া, ট্যানারি কারখানার বর্জ্য পদার্থ, জেট বিমান, রকেট উৎক্ষেপণ, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র প্রভৃতি থেকে নাইট্রাস অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফারের কণা নির্গত হয়; যেগুলি বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী এক একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ।

৩) অরণ্যচ্ছেদনঃ গাছপালা উজাড় হওয়ার ফলে বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নেওয়ার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে ।

৪) মিথেনের পরিমান বৃদ্ধিঃ গাছপালার পচন, কৃষিজ বর্জ্য এবং জীবজন্তুদের বর্জ্য থেকে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলাফলঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং – এর ফলাফলগুলি হলো নিম্নরূপ –

ক) পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে পৃথিবী গত ২০ লাখ বছরের মধ্যে সবচেয়ে গরম হয়ে যাবে । ১৮৮০ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা ০.৬° C বেড়েছে । ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর উষ্ণতা ২.৫° C এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ৩.৮° C বেড়ে যেতে পারে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত ২০০০০ বছরের তুলনায় শেষ শতকে বিশ্বের উষ্ণতা বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে । বিংশ শতাব্দীর দুটি অধ্যায়ে (যথা – ১৯২০-১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ এবং ১৯৭৬-২০০০ খ্রিষ্টাব্দ) উষ্ণতা সবথেকে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে । ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে হিসাব করলে বিশ্বের

উষ্ণতম দশক হচ্ছে ১৯৯০ এর দশক। নাসার গোদার্দ ইনস্টিটিউট ফর স্পেন স্টাডিজের হিসাব অনুযায়ী ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে উষ্ণতম বছর। কিন্তু ওয়ার্ল্ড মিটিয়েরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট ও ক্লাইমেট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতে, উষ্ণতম বছর হলো ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ এবং দ্বিতীয় উষ্ণতম বছর হলো ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ।

খ) মেরু অঞ্চলের বরফ গলনঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে বিষুবীয় ও মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে। মনে করা হচ্ছে, আর ১০০ বছরের মধ্যসহ সুমেরু কুমেরুতে জমে থাকা সমস্ত বরফ জলে পরিনত হবে। শীতে অল্প বরফ থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের পর উত্তর মহাসাগরের বরফের স্তর প্রায় ২৭% হ্রাস পেয়েছে।

গ) সমুদ্র জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধিঃ এই ক্রমবর্ধমান উষ্ণতার ফলে বিষুবীয় ও মেরু অঞ্চলের জমে থাকা বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলস্তর ৩০ – ৪০ সেন্টিমিটার বেড়ে যাবে। এর ফলে পৃথিবীর উপকূলবর্তী এলাকার (ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশসহ) একটি বিরাট অংশ সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। উল্লেখ্য, পৃথিবীতে সঞ্চিত সমস্ত বরফ গলে গেলে সমুদ্রপৃষ্ঠের জলতলের উচ্চতা প্রায় ৫০ মিটার বেড়ে যাবে।

ঘ) রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিঃ ম্যালেরিয়া, গোদ, কলেরা ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বাড়বে; তার কারণ জল বাড়লে মশা বাড়বে। আরো ভিন্ন রোগ ফিরে আসবে ,নতুন রোগ আসবে। কেনিয়ার উচ্চভূমিতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে অতীতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রায় ছিল না বললেই চলে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ৬৯০০ ফুট উচ্চতায় এইপ্রথম ম্যালেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। কলম্বিয়ার আন্দিজ পর্বতমালায় ৭০০০ ফুট উচ্চতায় ডেঙ্গু ও পীতজ্বর সংক্রামক মশার সংখ্যা বাড়ছে।

ঙ) বাস্তুতন্ত্রের বিনাশঃ সমুদ্রে ক্ষারের পরিমাণ কমবে, ফলে ক্ষারে বেচে থাকা জীবের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ ঘটবে। গত ৫০ বছরে মেরুপ্রদেশে পেঙ্গুইনের সংখ্যা কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। এছাড়াও, গত ৫০ বছরে বিশ্বের ২৭% প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস হয়ে গেছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে স্কটল্যান্ডের জীববৈচিত্রের বিনাশ ঘটেছে। ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে হাজার হাজার পক্ষীকূলের বিনাশ ঘটছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ২০ বছরের মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের জীববৈচিত্রের প্রায় ৫০% ধ্বংস হয়ে যাবে।

চ) আবহাওয়ার প্রকৃতি পরিবর্তনঃ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবার ফলে অধঃক্ষেপণের পরিমাণ, ঝড়ঝঞ্জার প্রকোপ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাবে। ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। বৃষ্টিবহুল এলাকা নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ক্রমশ বাড়তে থাকবে। ফলে আবহাওয়ার প্রকৃতিরও পরিবর্তন হবে। এথেন্স, শিকাগো, দিল্লী, প্যারিসসহ পৃথিবীর অন্যান্য শহরে গ্রীষ্মকাল স্বাভাবিকের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ীও যেমন হচ্ছে, তেমনই গ্রীষ্মকালে অসহনীয় গরমও পড়ছে। তিব্বত, আফগানিস্তান, ভারত, নেপালসহ বহু দেশে শীতকাল স্বল্পস্থায়ী হওয়ার পাশাপাশি শীতের মাত্রাও কমে গেছে। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্লাসগো ও মন্টানায় তাপমাত্রা সারাবছরে একবারও ০°C এর নীচে নামেনি, যা সেখানকার অদ্যাবধিকাল পর্যন্ত সর্বকালীন রেকর্ড। আবার, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ ছিল নিউইয়র্কের ইতিহাসে উষ্ণতম ও শুষ্কতম বছর।
ছ) ফসলের ক্ষতিঃ আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে ফসলের সমূহ ক্ষতি হবে এবং উৎপাদন কমে যাবে।

এছাড়াও, **জ) বনাঞ্চল ধ্বংস** হবে (১৯৯৮ সালে ইন্দোনেশিয়ায় এক ভয়াবহ দাবানলে প্রায় ২০ লক্ষ একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে), **ঝ) পানীয় জলে সংক্রমণ** দেখা দেবে, **ঞ) বন্যজন্তুর সংখ্যা হ্রাস** পাবে, **ট) মানুষের আবাসস্থলের সংকট** দেখা দেবে, **ঠ) বিশ্বজুড়ে খাদ্যভাব প্রকট** হবে, **ড) স্থানবিশেষে কোথাও ক্ষরা, আবার কোথাও বন্যার প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি** পাবে (১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে সারা পৃথিবীজুড়েই খরা ও বন্যার পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে), **ড) দুর্ভিক্ষ, মহামারী, খাদ্যদাঙ্গা শুরু** হবে। সব মিলিয়ে পৃথিবীতে নতুন নতুন ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হবে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ন্ত্রনের উপায়ঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি হলো নিম্নরূপ –
ক) জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার হ্রাসঃ কলকারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন সবকিছুতেই জীবাশ্ম জ্বালানী জ্বালানোর পরিমাণ ক্রমশ যতটা পারা যায় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমান যথাসম্ভব কমাতে সম্ভব হয়।
খ) রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাসঃ কৃষিতে নাইট্রোজেন সার (যেমন ইউরিয়া) ব্যাবহারের ফলে বাড়ছে নাইট্রজেন অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ। অবিলম্বে কৃষিকাজে

রাসায়নিক সারের ব্যবহার যথাসম্ভব কমাতে হবে।

গ) মিথেন নির্গমনের পরিমাণ হ্রাসঃ গাছপালার পচন এবং জীব জন্তুদের বর্জ্য থেকে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিথেনের এই সকল উৎসগুলিকে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ঘ) অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিঃ অচিরাচরিত শক্তি বলতে সেইসব শক্তিকেই বোঝায় যাদের ব্যবহার এখনও পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে সেই অর্থে প্রচলিত হয়নি। এইসকল শক্তির অধিকাংশেরই উৎস পুনর্নবীকরণ করা যাবে অর্থাৎ, ফুরিয়ে গেলে আবার তৈরি করে নেওয়া সম্ভব। জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারে বায়ুমন্ডলে গ্রীণ হাউস গ্যাসের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশ। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানীর পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার করলে বায়ুমন্ডল (যেমন – কার্বন-ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ওজোন) এর পরিমাণ কমে আসবে। ফলে পরিবেশ দূষণ অনেকটাই কমে যাবে। সাম্প্রতিক কালে এই অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলাপ আলোচনা হচ্ছে। এই চিরাচরিত শক্তিগুলি হল – সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস, বায়োডিজেল, জোয়ার-ভাটা শক্তি, ভূ-তাপীয় শক্তি, আবর্জনা থেকে প্রাপ্ত শক্তি, নিউক্লিয়ার এনার্জি প্রভৃতি।

ঙ) ই-ওয়েস্ট বা ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য আমদানী বন্ধঃ উন্নত বিশ্বের দেশগুলো থেকে নানা ধরণের ই-ওয়েস্ট বা ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য আমদানী হচ্ছে আমাদের দেশে। প্রতি বছর প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ব্যবহৃত (সেকেন্ড হ্যান্ড) কম্পিউটার তৃতীয় বিশ্বে পাঠানো হচ্ছে। এসব কম্পিউটারের অন্যতম ক্রেতা হলো চীন, ভারত ও বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলি; অর্থাৎ, তৃতীয় বিশ্বের এইসকল দেশগুলিকে ইলেক্ট্রনিক বর্জ্যের আস্তাকুড়ে পরিণত করা হচ্ছে। এইসব ই-বর্জ্যের মধ্যে হাজার হাজার টন সীসাসহ রয়েছে আরও বহু বিষাক্ত উপাদান, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসছে। এসব দূষিত বর্জ্য পদার্থ বিভিন্নভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সরাসরি কৃষি সম্পদ, মৎস্যসম্পদ, বনজ সম্পদ বিনষ্টেরও অন্যতম কারণ।

চ) পরিকল্পিত বনায়নঃ বিশ্বজুড়ে যখন বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষেধক হলো অরণ্য। একদিকে অরণ্যচ্ছেদন রোধ ও অন্যদিকে পরিকল্পিতভাবে বনায়নের মধ্য দিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং অনেকটাই

নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।

ছ) শক্তিসাশ্রয়ী আবাসনঃ আমাদের জীবনযাপনের সবক্ষেত্রেই পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে । বড় বড় অট্টালিকা, বাড়িঘর বা বড় দালান নির্মাণে প্রয়োজনীয় খালি জায়গা রাখতে হবে । প্রাকৃতিক আলো-বাতাসের প্রবেশ যেন সহজে হয় সে ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে যাতে কম বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে হয় । লিফট, জেনারেটর, এয়ার কন্ডিশন এসবের ব্যবহার কমাতে গ্রীণ বিল্ডিং টেকনোলজির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে । শহরের পাশাপাশি গ্রামের বাড়িঘর নির্মাণেও বিদ্যুত সাশ্রয়ী সবুজায়ন প্রয়োজন ।

জ) পরিবেশ রক্ষাসংক্রান্ত চুক্তিগুলির দ্রুত বাস্তব রূপায়ণঃ বিশ্বে ক্রমবর্দ্ধমান বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে চুক্তিগুলির দ্রুত বাস্তব রূপায়ণ খুবই দরকার । কেবলমাত্র আলাপ-আলোচনা নয়, দরকার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির দ্রুত ও বাস্তব রূপায়ণ ।

ঝ) বিকল্প ও পরিবেশবান্ধব দ্রব্য ব্যবহার GREEN HOUSE GAS সৃষ্টিকারী উপাদানগুলির বিকল্প ও পরিবেশবান্ধব দ্রব্য ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে ।

ঞ) নতুন প্রযুক্তিঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধের চূড়ান্ত উত্তর হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি । তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত উপাদান পরিবর্তন, যানবাহনের দক্ষতা বৃদ্ধি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড পৃথকীকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রভৃতিসহ বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে ।

ট) নাগরিক দায়িত্বঃ পরিবেশ রক্ষা নাগরিকদের মৌলিক দায়িত্ব । তাই বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং সৃষ্টিকারী উপাদানগুলি যাতে পরিবেশে কম পরিমানে উৎপাদিত হয়, সে বিষয়ে সকলকেই দায়িত্বশীল হতে হবে ।

:THE END: